জিরো

অধ্যায় ছয়

অসীমের যমজ

[শূন্যের অসীম বৈশিষ্ট্য]

ঈশ্বর পূর্ণসংখ্যা সৃষ্টি করেছেন। বাকি সব মানুষের কর্ম।

-- লিওপোল্ড ক্রোনেকা

শূন্য আর অসীমকে সবসময় সন্দেহজনকভাবে সমজাতীয় মনে হচ্ছিল। কোনোকিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ দিন। পাবেন শূন্য। অসীমকে কোনোকিছু দিয়ে গুণ দিলেও শূন্য। কোনো সংখ্যাকে শূন্য দিয়ে ভাগ দিলে আসবে অসীম। আর অসীম দিয়ে ভাগ দিলে শূন্য। কোনো সংখ্যার সাথে শূন্য যোগ করলে তাতে কোনো পরিবর্তন আসে না। অসীমের সাথেও কাউকে যোগ করলে কোনো পরিবর্তন নেই।

রেনেসাঁর সময় থেকেই এ মিলগুলো স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। তবে শূন্যের বড় রহস্য উন্মোচন করতে গণিতবিদদেরকে অপেক্ষা করতে হয়েছে ফরাসি বিপ্লব শেষ হওয়া পর্যন্ত।

শূন্য আর অসীম একই মুদ্রার দুই পিঠ। সমান ও বিপরীত। ইন ও ইয়াং১। সংখ্যারেখার দুই মাথায় সমশক্তিমান দুই প্রতিপক্ষ। শূন্যের ঝামেলাময় বৈশিষ্ট্য তাল মিলিয়ে চলে অসীমের অদ্ভুত ক্ষমতার সাথে। শূন্যকে বুঝতে পারলেই অসীমকেও বোঝা সম্ভব হয়ে যায়। এটা বুঝতে গিয়ে গণিতবিদদের পা দিতে হয় কাল্পনিক এক অদ্ভুত জগতে। যেখানে বৃত্তরা রেখা, রেখারা বৃত্ত। আর অসীমের অবস্থান দুই বিপরীত মেরুতে।

স্বর্গীয় চেতনার এক দারুণ ও বিস্ময়কর আশ্রয়স্থল। অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের প্রায় মিলন যেখানে।

-- গটফ্রিড উইলহেল্ম লাইবনিৎস

বহু শতক ধরে গণিতবিদদের অবহেলার পাত্র শূন্য একা হয়নি। শূন্য যেভাবে গ্রিকদের কুসংস্কারের আগুনে পুড়েছে, অন্য সংখ্যাও হয়েছে অবহেলার শিকার। যে সংখ্যাদের ছিল না জ্যামিতিক অর্থ (গ্রিকরা সংখ্যার জ্যামিতিক দিকটাই বুঝত শুধু)। এমন একটি সংখ্যা i। শূন্যের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যের মূলে এ সংখ্যাটারও ভূমিকা আছে।

বীজগণিতের মাধ্যমে সংখ্যাকে বোঝার আরেকটা দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া গেল। যা গ্রিকদের জ্যামিতিক ধারণা থেকে পুরোপুরি আলাদা। গ্রিকদের মতো পরাবৃত্তের ক্ষেত্রফল পরিমাপের বদলে বীজগণিতবিদরা বিভিন্ন সংখ্যার সম্পর্কের সমীকরণের সমাধান খোঁজার পথে হাঁটলেন। যেমন 4x – 12 = 0 সরল সমীকরণটির কথা ভাবুন। এ সমীকরণ বলছে ০, ৪ ও ১২-এর সাথে অজানা সংখ্যা x-এর সম্পর্ক। বীজগণিতের ছাত্রের কাজ হলো x-এর মান ব বের করা। এ সমীকরণে x-এর মান ৩। সমীকরণে x-এর বদলে ৩ বসিয়ে দেখুন সমীকরণ শুদ্ধ হচ্ছে। 4x – 12 = 0 সমীকরণের সমাধান বা মূল ৩।

বিভিন্ন চিহ্নকে জোড়া দিয়ে সমীকরণ বানাতে থাকলে অপ্রত্যাশিত জিনিসের মুখোমুখি হতে হয়। যেমন ওপরের সমীকরণে বিয়োগ চিহ্ন (-) উঠিয়ে যোগ চিহ্ন (+) বসিয়ে দিন। পাওয়া যাবে সরল-দর্শন এক সমীকরণ: 4x +12 = 0। তবে এ সমীকরণের সমাধান (-৩), যা ঋণাত্মক সংখ্যা।

ভারতীয় গণিতবিদরা যখন শূন্যকে গ্রহণ করলেন, ইউরোপীয়রা বহু শতক ধরে একে অবজ্ঞা করে গেছে। একইভাবে প্রাচ্য যখন ঋণাত্মক সংখ্যাকে বুকে টেনে নিল, পশ্চিম তাকেও অবহেলা করতে চাইল। এমনকি সতের শতকে এসেও ডেকার্ট সমীকরণের সমাধান হিসেবে ঋণাত্মক সংখ্যাকে মেনে নিতে রাজি হননি। তিনি এদেরকে নাম দেন নকল সমাধান বা মূল। আর ঠিক এ কারণেই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাকে ঋণাত্মক সংখ্যা পর্যন্ত বর্ধিত করেননি। তবে ডেকার্ট সংকীর্ণ ধারণার পতন যুগের মানুষ। বীজগণিত ও জ্যামিতির মিলনের সফলতার শিকার তিনি। বীজগণিতবিদদের কাছে ঋণাত্মক সংখ্যা অনেক আগেই থেকেই কাজের জিনিস। পশ্চিমের গণিতবিদরাও কাজে লাগিয়েছেন সংখ্যাগুলোকে। সমীকরণ সমাধান করতে গেলে হরদম দেখা মিলছিল ঋণাত্মক সংখ্যার। এমন এক ধরনের সমীকরণ হলো দ্বিঘাত (quadratic) সমীকরণ।

4x – 12 = 0 ধরনের সরলরৈখিক সমীকরণ সমাধান করা খুব সহজ। তবে এ ধরনের সমস্যা বীজগণিতবিদদের বেশিদিন ব্যস্ত রাখতে পারল না। তাদের চাই আরও কঠিন সমস্যা। কাজ শুরু করলেন দ্বিঘাত সমীকরণ নিয়ে। এ সমীকরণ শুরু হয় x2 দিয়ে। যেমন x2 – 1 = 0। সাধারণ সমীকরণের চেয়ে এরা জটিল। প্রথমত, এদের মূল থাকে দুটি। যেমন x2 – 1 = 0 এর মূল দুটি হলো ১ ও (-১)। সমীকরণে 1 বা (-1) বসিয়ে দেখুন কী হয়। ফলে সমীকরণে ১ বা (-১) দুটোই কাজ করে। x2 – 1 থেকে আমরা পাই (x + 1)(x – 1), যা থেকে বোঝা যায় ১ বা (-১) বসালে রাশিটা শূন্য হয়।

দ্বিঘাত সমীকরণ সরলরৈখিক সমীকরণের চেয়ে জটিল হয়ে এদের মূল বের করার একটি সহজ উপায় আছে। একে বলে দ্বিঘাত সূত্র, যা উচ্চমাধ্যমিক পাশ করা যেকোনো শিক্ষার্থী গুরুত্বসহকারে পড়ে। ax2 + bx + c দ্বিঘাত সমীকরণের মূল হবে x = (- b ± √(b2 – 4ac))/2a। ধনাত্মক চিহ্ন (+) থেকে একটি ও ঋণাত্মক চিহ্ন (-) থেকে পাই আরেকটি মূল। বহু বছর ধরে মানুষ দ্বিঘাত সমীকরণের কথা জানে। নবম শতকের গণিতবিদ খোয়ারিজমি প্রায় সব দ্বিঘাত সমীকরণ সমাধান করতে পারতেন। তবে তিনি ঋণাত্মক সংখ্যাকে সম্ভবত মূল হিসেবে মানতেন না। তবে তারপর দ্রুতই ঋণাত্মক সংখ্যাকে সমাধান হিসেবে গ্রহণ করে নেন বীজগণিতবিদরা। তবে কাল্পনিক সংখ্যার কথা একটু আলাদা।

সরলরৈখিক সমীকরণে কাল্পনিক সংখ্যা আসে না। তবে দ্বিঘাত সমীকরণে এদের দেখা যেতে থাকল। x2 + 1 = 0 সমীকরণটার কথা ভাবুন। দেখে মনে হয় কোনো সংখ্যা বসিয়েই এর সমাধান পাওয়া যাবে না। -1, 3, 500 বা 30.24 যাই বসান সমীকরণ সিদ্ধ হবে না২। আপনার ইচ্ছামতো যেকোনো ধনাত্মক বা ঋণাত্মক সংখ্যাই বসান না কেন, এ সমীকরণের মূল পাবেন না। এর চেয়ে করুণ কথা হলো, দ্বিঘাত সমীকরণ প্রয়োগ করতে গেলে দুটি অদ্ভুত উত্তর মেলে। +√(-1) ও -√(-1) ।

দেখে এদের কোনো অর্থ আছে বলে মনে হয় না। বার শতকে ভারতীয় গণিতবিদ ভাস্কর বলেছিলেন, ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূল নেই। কারণ ঋণাত্মক সংখ্যা বর্গসংখ্যা নয়। ভাস্কর এবং অন্যরা বুঝতে পেরেছিলেন, ধনাত্মক সংখ্যার বর্গ ধনাত্মক। ২-কে ২ দিয়ে গুণ করলে ৪ হয়। ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গও ধনাত্মক। (-২)-একে (-২) দিয়ে গুণ করলেও ৪ হয়। শূন্যের বর্গ শূন্য। ধনাত্মক সংখ্যা, ঋণাত্মক সংখ্যা ও শূন্য সবাই অঋণাত্মক বর্গ দেয় ফল হিসেবে। পুরো সংখ্যারেখা এই তিনটি সম্ভাবনা দিয়েই পূর্ণ। তার মানে, সংখ্যারেখায় এমন কোনো সংখ্যা নেই, যাকে বর্গ করলে ঋণাত্মক সংখ্যা আসবে। ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গকে মনে হচ্ছিল হাস্যকর এক ভাবনা।

ডেকার্ট এ সংখ্যাদের ঋণাত্মক সংখ্যার চেয়েও খারাপ মনে করতেন। ঋণাত্মক সংখ্যার বর্গমূলের একটি তুচ্ছ নামও দেন তিনি: কাল্পনিক সংখ্যা (imaginary number)। এ নামটিই পরে থেকে যায়৩। (-১) এর বর্গমূলের প্রতীক এখন i।

বীজগণিতবিদরা i-কে ভালবাসলেন। বাকি প্রায় সবাই একে ঘৃণা করলেন। x3 + 3x + 1 রাশিটির মতো বহুপদীর সমাধানে কাল্পনিক সংখ্যা দারুণ কাজে লাগল। আসলে i-কে সংখ্যা হিসেবে মেনে নিলে সব বহুপদী সমাধান করা যায়। x2 + 1 ভাগ হয়ে হয় (x + i)(x - i)। সমীকরণের মূল হয় i ও (-i)। x3 – x2 +x – 1 এর মতো ত্রিঘাত সমীকরণ ভাগ হয় তিনভাগে। (x – 1) (x + i) (x- i)। x4 দিয়ে শুরু চতুর্ঘাতী রাশি ভাগ হয় চারভাগে। x5 দিয়ে শুরু পঞ্ছঘাতীরা পাঁচ ভাগে। n ঘাতের বহুপদীরা শুরু হয় xn দিয়ে, আর এরা বিভক্ত হয় n টি আলাদা (অনেকসময় দুই মূল একই হতে পারে। যেমন x2 – 2x + 1 = 0 বা (x-1)2 = 0 সমীকরণের দুটি মূলই ১। তবে মূলের সংখ্যা কিন্তু ২-ই।) রাশিতে। একে বলে বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্য।

ষোলো শতকের শুরু থেকেই গণিতবিদরা i-যুক্ত সংখ্যা ব্যবহার করছিলেন। ত্রিঘাত ও চতুর্ঘাতী সমীকরণ সমাধান করতে গিয়ে তথাকথিত এই জটিল৪ সংখ্যাদের ব্যবহার চলে আসে। অনেক গণিতবিদ জটিল সংখ্যাকে একটি সুবিধাজনক কল্পনা হিসেবে মেনে নেন। তবে এর মধ্যেই বাকিরা খুঁজে পান ঈশ্বরকে।

লিবনিজ মনে করতেন, i হলো অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মাঝে এক অদ্ভুত মিলন। অনেকটা যেন তাঁর বাইনারি৫ সংখ্যার ১ (ঈশ্বর) ও ০ (শূন্যতা) এর মিলন। লিবনিজ i-কে পবিত্র আত্মার৬ সাথে তুলনা করেন। দুটোরই অস্তিত্ব অবস্তুগত ও নামে মাত্র মূর্ত। তবে এমনকি লিবনিজও বুঝতে পারেননি একসময় শূন্য ও অসীমের সম্পর্ক প্রকাশ করবে i। তবে সে সম্পর্কের জট খুলতে গণিতে আরও দুটো গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি প্রয়োজন হয়েছিল।

বিন্দু ও প্রতিবিন্দু

এ ধারণাগুলো কত সহজে পরিচিত বৈশিষ্ট্য ও আরও অসীমসংখ্যক জিনিসের দিকে ইঙ্গিত করে তা তখন সহজেই বোঝা যাবে, সাধারণ জ্যামিতি সহজে সহজে যার ঠাঁই খুঁজে পায় না।

-- জঁ ভিক্টর পঁসলে

প্রথম অগ্রগতি ছিল প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি (projective geometry)। শাখাটার জন্ম যুদ্ধের ডামাডোলের মধ্যে। ১৭০০ সালের প্রথম দশকের কথা। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রুশিয়া, নেদারল্যান্ড ও অন্যান্য দেশ ক্ষমতার লড়াইয়ে লিপ্ত। একের পর এক জোট গড়ছে ও ভাঙছে। বিভিন্ন উপনিবেশ নিয়ে তৈরি হচ্ছে আঞ্চলিক বিবাদ। দেশগুলো নিউ ওয়ার্ল্ডের (নতুন আবিষ্কৃত অ্যামেরিকা মহাদেশ) সাথে বাণিজ্যিক আধিপত্য ধরে রাখতে লড়ছে। আঠারো শতকের প্রথমার্ধজুড়ে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশ খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হতে থাকে। নিউটন মারা যাওয়ার প্রায় সিকিশতক পরে যুদ্ধ পুরোদমে ছড়িয়ে পড়ে। ফ্রান্স, ইংল্যান্ড, স্পেন ও রাশিয়া ইংল্যান্ড ও প্রুশিয়ার সাথে লড়ে নয় বছর।

১৭৬৩ সালে ফ্রান্স আত্মসমর্পণ করে। অবসান হয় সাত বছরের যুদ্ধের (যুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হওয়ার আগেই দুই বছর যুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল)। যুদ্ধে জয়ের মাধ্যমে ইংল্যান্ড গুরতপূর্ণ শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়। তবে তার জন্য মূল্যও দিতে হয়। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড দুই দেশই নিঃস্ব হয়ে যায়। জর্জরিত হয় ঋণের ভারে। দুই দেশই পরিণতিও ভোগ করে। ঘটে বিপ্লব। সাত বছরব্যাপী যুদ্ধের এক দশকের কিছু পরে শুরু হয় মার্কিন বিপ্লব। ইংল্যান্ড হারায় তার সবচেয়ে বড় উপনিবেশ। ১৭৮৯ সালে জর্জ ওয়াশিংটন নতুন জন্ম নেওয়া যুক্তরাষ্ট্রের শাসন শুরু করেন। আর ওদিকে শুরু হয় ফরাসি বিপ্লব। চার বছর পরে বিল্পবীরা ফরাসি রাজার গর্দান কেটে ফেলে।

গ্যাসপা মঞ্জ নামে এক গণিতবিদ রাজার মৃত্যদণ্ড কার্যকরের নথিতে স্বাক্ষর করেন। গ্যাসপা ছিলেন পূর্নাঙ্গ এক জ্যামিতিক। বিশেষ দক্ষতা ছিল ত্রিমাত্রিক জ্যামিতিতে। স্থপতি ও প্রকৌশলীদের ভবন ও যন্ত্র নির্মাণের পদ্ধতির পেছনে অবদান ছিল মঞ্জের। তারা নকশাকে উলম্ব ও অনুভূমিক তলে প্রক্ষেপণ (project) করে। বস্তুটাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য সম্পূর্ণ তথ্য সংরক্ষিত থাকে। সামরিক বাহিনীর কাছে মঞ্জের কাজের ছিল বিশেষ গুরুত্ব। তাই কাজের বড় অংশই বিপ্লবী সরকার রাষ্ট্রীয় গোপনীয় নথি হিসেবে ব্যবহার করে। পরবর্তী ন্যাপোলিয়নের সরকারও সে ধারা বজায় রাখে।

জঁ ভিক্টর পঁসলে ছিলেন মঞ্জের ছাত্র। ন্যাপোলিয়নের বাহিনীতে প্রকৌশলী হিসেবে প্রশিক্ষণ নেওয়ার সময় তিনি ত্রিমাত্রিক জ্যামিতি সম্পর্কে জানতে পারেন। পঁঁসলের দূর্ভাগ্য। তিনি বাহিনীতেও ঢুকলেন, আর ন্যাপোলিয়নও যাত্রা করলেন রাশিয়ার দিকে। এটা ১৮১২ সালের কথা।

মস্কো থেকে ফেরার পথে ন্যাপোলিয়নের বাহিনী দুটি বিপর্যয়ের মুখে পড়ে। একটি হলো কনকনে শীত। আরেকটি একইরকম ভয়ানক রুশ বাহিনী। এতে বাহিনী অনেক ছোট হয়ে যায়। ক্রাসনয়ের যুদ্ধে পঁসলেকে মৃত ভেবে সবাই যুদ্ধক্ষেত্রে ফেলে যায়। তবে মারা না গেলেও পরে রুশ বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন তিনি। রুশ কারাগারে পঁচতে পঁচতে পঁসলে জ্ঞানের নতুন শাখার সন্ধান পান: প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি।

পঁসলের কাজের মাধ্যমে পনের শতকের শিল্পী ও স্থপতিদের কাজ পূর্ণতা পায়। এই শিল্পীদের মধ্যে আছে ফিলিপো ব্রুনেলেস্কি। আছেন লিওনার্দো দা ভিঞ্চি, যিনি আনুপাতিক আকার (perspective) ধরে রেখে বাস্তব চিত্র আঁকার পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। কোনো চিত্রে "সমান্তরাল" রেখারা মিলিয়ে যাওয়া বিন্দুর দিকে অগ্রসর হলে পর্যবেক্ষকের কাছে মনে হবে, রেখারা কখনোই মিলিত হবে না। মেঝের বর্গ চিত্রে পরিণত হয় ট্রাপিজয়ডে। সবকিছু মৃদুভাবে বিকৃত হয়। তবে দর্শকের কাছে তা পুরোপুরি নিখুঁত লাগে। অসীম দূরের বিন্দুর বৈশিষ্ট্যই এটা। অসীমের শূন্য।

জোহানের কেপলার এই ধারণাটা কাজে লাগালেন। তিনি আবিষ্কার করেছিলেন, গ্রহরা উপবৃত্তাকার পথে চলে। অসীম দূরের ভাবনাকে তিনি আরও এক ধাপ এগিয়ে নিলেন। উপবৃত্তের আছে দুটি কেন্দ্র। যাদের নাম ফোকাস বা উপকেন্দ্র। উপবৃত্ত যত লম্বা হবে, উপকেন্দ্ররা থাকবে তত দূরে। সব উপবৃত্তেরই আছে এ বৈশিষ্ট্য। ধরুন আপনার কাছে উপবৃত্তাকার একটি দর্পণ (আয়না) আছে। এর একটি উপকেন্দ্রে একটি বাতি বসিয়ে তার আলোগুলো আরেক উপকেন্দ্রে মিলিত হবে। উপবৃত্ত যত লম্বাই হোক এ ব্যাপারটা ঘটবেই (চিত্র ২৯)।

মনে মনে কেপলার উপবৃত্তকে অনেক লম্বা করলেন। উপকেন্দ্রদুটিকে নিয়ে গেলেন অনেক অনেক দূরে। এরপর কল্পনা করলেন, একটি অপরটি থেকে অসীম দূরে। দ্বিতীয় উপকেন্দ্র অসীমের এক বিন্দু। হঠাৎ উপবৃত্ত হয়ে গেল পরাবৃত্ত। আগের যে রেখারা একটি বিন্দুতে মিলিত হলো তারা এখন হয়ে গেল সমান্তরাল। পরাবৃত্তও তাই এমন এক উপবৃত্ত, যার একটি উপকেন্দ্র আছে অসীমে (চিত্র ৩০)।

চিত্র ২৯: উপবৃত্তের ভেতরে আলোকরশ্মি

একটি ফ্ল্যাশলাইট দিয়ে আপনি এটা সহজেই দেখতে পারবেন। একটি অন্ধকার কক্ষে যান। দেয়ালের কাছে কাছে দাঁড়িয়ে সোজা আলো ফেলুন তাতে। সুন্দর একটি গোল বৃত্ত দেখতে পাবেন। দেয়ালে প্রক্ষেপিত আলো তৈরি করেছে এ বৃত্ত। এবার লাইটের মাথা একটু করে ওপরে উঠাতে থাকুন (চিত্র ৩১)। দেখবেন, বৃত্ত লম্বা হয়ে ক্রমেই বড় থেকে আরও বড় উপবৃত্ত হয়ে যাচ্ছে। এরপর হঠাৎ দেখবেন, উপবৃত্ত নেই আর। হয়ে গেছে পরাবৃত্ত। ফলে কেপলারের অসীমের বিন্দু থেকে দেখা গেল, পরাবৃত্ত এবং উপবৃত্ত আসলে একই। এর মাধ্যমে সূচনা হয় প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতির। গণিতবিদরা এখানে দেখেন জ্যামিতিক আকৃতির ছায়া ও প্রক্ষেপণ। এর মাধ্যমে জানা যায় বহু গুপ্ত সত্য। যে সত্য উপবৃত্ত আর পরাবৃত্তের সমতুল্যতার চেয়ে শক্তিশালী। তবে সবকিছুই নির্ভর করে অসীমে অবস্থিত বিন্দুকে মেনে নেওয়ার মধ্যে।

চিত্র ৩০: উপবৃত্তকে বড় করলেই পাওয়া যায় পরাবৃত্ত

চিত্র ৩১: আলো জ্বেলে উপবৃত্ত ও পরাবৃত্ত দেখা যায়

জিরার ডেজার্গ ছিলেন সতের শতকের ফরাসি স্থপতি। প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতির প্রাথমিক এক অগ্রনায়ক। অসীমের বিন্দু কাজে লাগিয়ে তিনি অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ নতুন উপপাদ্য প্রমাণ করেন। তবে ডেজার্গের সহকর্মীরা তাঁর লেখার অনেক শব্দ বুঝতে পারেননি। ফলে ধরে নিয়েছিলেন, লোকটা পাগল হয়ে গেছে। ব্যতিক্রমও আছে। ব্লেজ প্যাসকেলসহ কিছু গণিতবিদ ডেজার্গের কাজ এগিয়ে নিয়েছিলেন। তবে মানুষ তা ভুলে যায়।

জঁ ভিক্টর পঁসলের কাছে এসবের কোনো গুরুত্ব ছিল না। মঞ্জের ছাত্র হিসেবে পঁসলে কোনো চিত্রকে দুটি তলে প্রক্ষিপ্ত করার কৌশল শিখেছিলেন। আর যুদ্ধবন্দী হিসেবে হাতে ছিল প্রচুর অবসর সময়। কারাগারে বন্দী থাকার সময় তিনি অসীমের বিন্দু পুনরায় আবিষ্কার করেন। একে জোড়া দেন মঞ্জের কাজের সাথে। এর মাধ্যমে হয়ে যান প্রথম প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতিক। রাশিয়া থেকে ফেরার সময় সেদেশী একটি অ্যাবাকাস সঙ্গে নিয়ে আসেন। সময়ের তুলনায় যদিও সেটা পুরনো এক অদ্ভুত যন্ত্র। যাই হোক, এর মাধ্যমেই তিনি প্ররক্ষেপণমূলক জ্যামিতিকে উঁচু শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যান৭। তবে পঁসলের ধারণাই ছিল না যে প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি শূন্যের রহস্যময় বৈশিষ্ট্য বের করে আনবে। কারণ এর জন্যত দ্বিতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। সেটি হলো জটিল৪ (সংখ্যার) তল। ধাঁধাঁর এ অংশের জন্য আমাদেরকে জার্মানি ফিরে যেতে হবে।

কার্ল ফ্রিদরিচ গাউসের জন্ম ১৭৭৭ সালে। অল্প বয়সেই মেধার স্বাক্ষর রাখা শুরু করেন তিনি। গণিতের পথচলা শুরু হয় কাল্পনিক সংখ্যার কাজ দিয়ে। তাঁর পিএইচডি থিসিসের বিষয় ছিল বীজগণিতের মৌলিক উপপাদ্যের প্রমাণ। n ঘাতের বহুপদীর n সংখ্যক মূল (সমাধান) আছে। যেমন দ্বিঘাত সমীকরণের দুটি, ত্রিঘাত সমীকরণের তিনটি, চতুর্ঘাত সমীকরণের চারটি ইত্যাদি। এটা সত্য হবে বাস্তব মূলের পাশাপাশি কাল্পনিক সংখ্যাকেও মূল হিসেবে মেনে নিলে।

সারা জীবনজুড়ে গাউস নানান বিষয়ের ওপর কাজ করেছেন। বক্রতা নিয়ে তাঁর কাজ আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্বের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তবে জটিল সংখ্যাকে লেখচিত্রে উপস্থাপনের মাধ্যমেই গাউস গণিতের নতুন একটি কাঠামো বের করে আনেন।

১৮৩০ এর দশক তখন। প্রতিটি জটিল সংখ্যাকে (যেমন - 3 + 2i) কার্তেসীয় ছকে প্রদর্শন করা যায়। জটিল সংখ্যার বাস্তব অংশকে (-3) অনুভূমিক ও কাল্পনিক অংশকে উলম্ব অক্ষে (2) বসানো যায় (চিত্র ৩২)। এ কাঠামোর নাম জটিল তল। সরল এ কাঠামোই সংখ্যাদের ভূমিকা সম্পর্কে অনেক কথা বলে দিল। যেমন ধরুন i সংখ্যাটি। i ও x-অক্ষের মধ্যে কোণ ৯০ ডিগ্রি (চিত্র ৩৩)। i কে বর্গ করলে কী হবে? সংজ্ঞা অনুসারে, i2= - 1, যার সাথে x-অক্ষের কোণ ১৮০ ডিগ্রি (সরল রেখা)। মানে কোণ দ্বিগুণ হয়েছে। i3-এর মান -i। x-অক্ষের সাথে কোণ ২৭০ ডিগ্রি। কোণ হয়েছে তিনগুণ। i4 -এর মান ১। ৩৬০ ডিগ্রি ঘুরেছি। মূল কোণের চারগুণ (চিত্র ৩৪)। এটা কোনো কাকতালীয় ব্যাপার নয়। যেকোনো জটিল সংখ্যা নিয়ে এর কোণ মাপুন। কোনো সংখ্যার ঘাত n পর্যন্ত বাড়ানো আর এর কোণকে n দিয়ে গুণ দেওয়া একই কথা। সংখ্যাটার ঘাত বাড়াতে থাকলে এটি পেঁচিয়ে ভেতরে বা বাইরের দিকে যেতে থাকবে। সেটা নির্ভর করবে সংখ্যাটা একক বৃত্তের (মূলবিন্দুতে ব্যাসার্ধ এক একক বিশিষ্ট বৃত্ত) ভেতরে নাকি বাইরে তার ওপর (চিত্র ৩৫)। জটিল তলে গুণ ও সূচক পেল জ্যামিতিক ধারণা। ব্যাপারগুলো ঘটতে দেখা যাচ্ছে চোখের সামনে। এটাই ছিল দ্বিতীয় বড় অগ্রগতি।

চিত্র ৩২: জটিল তল

চিত্র ৩৩: ৯০ ডিগ্রিতে i-এর অবস্থান

চিত্র ৩৪: i-এর বিভিন্ন ঘাত

এ ভাবনাগুলোকে জোড়া দেন গাউসের ছাত্র জর্ক ফ্রিদরিচ বার্নাট রিমান। রিমান প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতিকে জটিল সংখ্যার সাথে একীভূত করেন। আর এতেই হঠাৎ রেখারা হয়ে গেল বৃত্ত। আর বৃত্তরা রেখা। আর শূন্য ও অসীম হয়ে গেল সংখ্যা দিয়ে ভর্তি গোলকের দুই বিপরীত মেরু।

চিত্র ৩৫: একক বৃত্তের ভেতরে ও বাইরে প্যাঁচ

রিমান জটিল তলের ওপর একটি আলোক-ভেদ্য গোলক কল্পনা করলেন। দক্ষিণ মেরু শূন্যকে স্পর্শ করে আছে। ধরুন উল্টো পাশের উত্তর মেরুতে একটি ক্ষুদ্র আলো রাখা হলো। এতে করে গোলকে আঁকা যেকোনো চিত্রের ছায়া পড়বে নিচের তলে। দুই মেরুর মাঝে আছে বিষুবরেখা। এর রেখার দাগের ছায়া হবে মূলবিদনুর সাপেক্ষে একটি বৃত্ত। দক্ষিণ গোলার্ধের যেকোনো ছবির ছায়া পড়বে বৃত্তের ভেতরে। আর উত্তর গোলার্ধের ছায়াগুলো হবে বৃত্তের বাইরে (চিত্র ৩৬)। মূলবিন্দু (০) আছে দক্ষিণ মেরুতে। জটিল তলে গোলকের প্রতিটি বিন্দুরই ছায়া পড়বে। ফলে গোলকের প্রতিটি বিন্দুই তলের ছায়ার সমতুল্য। আবার তলের প্রতিটি বৃত্তই গোলকের বৃত্তের কোনো বৃত্তের ছায়া। গোলকের বৃত্তের বিপরীতে আছে তলের বৃত্ত। তবে ব্যতিক্রম আছে একটি।

ধরুন একটি বৃত্ত গেল গোলকের উত্তর মেরুর ওপর দিয়ে। এর ছায়া কিন্তু বৃত্ত নয়। একটি রেখা। উত্তর মেরু যেন কেপলার ও পঁসলের কল্পিত অসীমের বিন্দু। তলে অবস্থিত রেখা গোলকের উত্তর মেরু দিয়ে যাওয়া বৃত্ত ছাড়া কিছুই নয়। অসীমের বিন্দু (চিত্র ৩৭)।

চিত্র ৩৬: ত্রিমাত্রিক গোলকের ছায়া দ্বিমাত্রিক তলে প্রক্ষেপণ (স্টেরিওগ্রাফিক প্রোজেকশন)

রিমান বুঝে ফেললেন, (অসীমের বিন্দুসহ) জটিল তল আর গোলক আসলে একই। এবার গণিতবিদরা দেখলেন গোলকের ঘূর্ণন ও বিকৃতির মধ্যেই লুকিয়ে আছে গুণ, ভাগসহ অন্যান্য জটিল গাণিতিক অপারেশন। যেমন i দিয়ে গুণ করা আর গোলককে ঘড়ির কাঁটার উল্টো দিকে ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেওয়া একই কথা। একটি সংখ্যা x নিন। একে পাল্টে লিখুন (x – 1)/ (x + 1)। এটা করা আর সম্পূর্ণ গোলককে ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে দেওয়া একই কথা। যার ফলে উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থাকবে বিষুব রেখায় (চিত্র ৩৮, ৩৯ ও ৪০)। তবে সবচেয়ে মজার জিনিস দেখা যায় একটি সংখ্যা x নিয়ে একে 1/x দিয়ে পাল্টে দিলে। এর মাধ্যমে গোলকটা পুরোপুরি উল্টে যায়। উপরটা নিচে আর নিচটা উপরে। এক কথায় দর্পণচিত্র। উত্তর মেরু হয়ে গেল দক্ষিণ মেরু আর দক্ষিণ মেরু উত্তর। শূন্য হয়ে গেল অসীম আর অসীম শূন্য। গোলকের জ্যামিতিটাই এমন। 1/∞= 0 এবং 1/0 = ∞। অসীম আর শূন্য রিমান গোলকের বিপরীত মেরু। আর এরা একে অপরের জায়গায় যেতে পারে মুহূর্তের মধ্যে। তাদের শক্তি সমান ও বিপরীত।

চিত্র ৩৭: রেখা ও বৃত্ত একই জিনিস

জটিল তলের সবগুলো সংখ্যাকে দি দিয়ে গুণ করুন। কাজটা যেন এমন: আপানর হাতটা দক্ষিণ মেরুতে রাখলেন, এরপর গোলকের ওপরের রাবারের একটি আবরণকে দক্ষিণ মেরু থেকে টেনে উত্তর মেরুর দিকে নিয়ে গেলেন। অর্ধেক (১/২) দিয়ে গুণ করার প্রভাব বিপরীত। এর মানে হলো রাবারটাকে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরুর দিকে নিয়ে আসা। অসীম দিয়ে গুণ করা মানে দক্ষিণ মেরুতে সুঁই ফুটিয়ে দেওয়া; সবটুকু রাবার উল্টে গিয়ে উপরের উত্তর মেরুর দিকে চলে যাবে। যেকোনো কিছুকে অসীম দিয়ে গুণ করলে অসীম আসে। শূন্য দিয়ে গুণ করা মানে উত্তর মেরুতে সুঁই ফুটিয়ে দেওয়া। সবকিছু এসে জমা হবে দক্ষিণ মেরুতে। যেকোনো কিছুকে শূন্য দিয়ে গুণ করলে শূন্যই হয়। অসীম আর শূন্য সমান ও বিপরীত। আর সমান ধ্বংসাত্মক।

চিত্র ৩৮: রিমান গোলক

চিত্র ৩৯: i দিয়ে রূপান্তরিত রিমান গোলক

চিত্র ৪০: (x – 1)/ (x + 1) দিয়ে রূপান্তরিত রিমান গোলক

শূন্য আর অসীম সন সংখ্যাকে গ্রাস করে নেওয়ার এক অনন্ত সংগ্রামে লিপ্ত। মানি ধর্মের দুঃস্বপ্নের মতো দুইয়ের অবস্থান সংখ্যাগোলকের দুই মেরুতে। ক্ষুদ্র ব্ল্যাকহোলের মতো গিলছে সংখ্যাদের। সংখ্যার তল থেকে যেকোনো সংখ্যা নিন। যেমন ধরুন নিলাম i/2। একে বর্গ করুন। ঘন করুন। ঘাত চার করুন। পাঁচ, ছয়, সাত। গুণ করতে থাকুন। এতে পেঁচিয়ে ক্রমেই শূন্যের দিকে যাচ্ছে। যেভাবে পানি গড়ায় ড্রেনের দিকে। সংখ্যাটা 2i হলে কী হত? ঠিক উল্টো। একে বর্গ করুন। ঘন করুন। ঘাত চার করুন। এটা পেঁচিয়ে বাইরের দিকে যাচ্ছে (চিত্র ৪১)। তবে সংখ্যাগোলকে দুই কার্ভ একে অপরের নকল। একে অপরের দর্পণ চিত্র (চিত্র ৪২)। জটিল তলের সব সংখ্যার একই ভাগ্য বরণ করতে হয়। শূন্য ও অসীমের দিকে এরা এগিয়ে যায় অপ্রতিরোধ্য উপায়ে। এদের থেকে বেঁচে থাকে গুটিকয়েক সংখ্যা। যাদের দূরত্ব দুই প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে সমান দূরে। যে সংখ্যারা আছে বিষুবরেখায়। এই যেমন ১, (-১) ও i। শূন্য ও অসীমের দড়ি টানা খেলায় এরা বিষুবরেখার চারপাশে অনন্তকাল পাক খেতে থাকে। মুক্ত হতে পারে না কোনটিরই বন্ধন থেকে। (ক্যালকুলেটরেও আপনি এটা যাচাই করে দেখতে পারেন। এতে যেকোনো একটি সংখ্যা বসান। একে বর্গ করুন। আবার করুন। আবার। এটি ক্রমেই অসীম বা শূন্যের দিকে চলে যাবে। ব্যতিক্রম হলো ১ ও (-১)। এখানে শুরু করলে নেই কোনো গতি।

অসীম শূন্য

আমার তত্ত্ব পাথরের মতো দৃঢ়। এর প্রতি ছোঁড়া প্রতিটি তীর উল্টো দিকে ঘুরে ফিরে যাবে তীরন্দাজের দিকে। আমি কীয়াভেব তা জানি? আমি এটা নিয়ে পড়েছি। খুঁজেছি এর শিকড়ের সন্ধান। সত্যই বলতে, সৃষ্ট জিনিসের মধ্যে প্রথম অব্যর্থ জিনিস এটা।

-- জর্ক ক্যান্টর

অসীম থাকল না আর অতীন্দ্রিয়। এটা হয়ে গেল সাধারণ এক সংখ্যা৮। প্রস্তুত বিশ্লেষণের জন্য। গণিতবিদরাও দ্রুতই একে নিয়ে কাজ শুরু করলেন। তবে অসীমের গভীর থেকে সংখ্যার বিশাল রাজ্য থেকে শূন্যকে বারবার উদয় হতে দেখা গেল। আরও ভয়ানক কথা হলো, অসীম নিজেই শূন্য হতে পারে।

চিত্র ৪১: তলের মধ্যে প্যাঁচ খেয়ে ভেতরে ও বাইরে যাওয়া

চিত্র ৪২: গোলকের মধ্যে অসীম ও শূন্য একে অপরের দর্পণ-চিত্র।

রিমান দেখলেন, জটিল আসলে একটি গোলক। তার আগের পুরনো দিনে 1/x-এর মতো ফাংশনগুলো নিয়ে চিন্তায় ছিলেন গণিতবিদরা। x শূন্যের দিকে গেলে 1/x বড় হতে থাকে। শেষ পর্যন্ত অসীমে গিয়ে বিস্ফোরিত হয়। অসীম পর্যন্ত যাওয়াকে পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য করে তোলেন রিমান। কারণ, গোলকের ওপরের আর দশটা বিন্দুর মতোই অসীমও একটি বিন্দু। অসীমে ভয় পাওয়ার দিন শেষ। সত্যি বলতে, গণিতবিদরা বিশ্লেষণ করে করে ফাংশনের বিস্ফোরিত হয়ে যাওয়া বিন্দুগুলোকে আলাদা করতে শুরু করলেন। এ বিন্দুগুলোর নাম সিংগুলারিটি বা অনন্যতা।

1/x কার্ভের সিংগুলারিটি পাওয়া যাবে x = 0 বিন্দুতে। খুবই সরল এক সিংগুলারিটি, যাকে গণিতবিদরা নাম দেন মেরু। অন্য ধরনের সিংগুলারিটিও আছে। যেমন sin(1/x) কার্ভের অপরিহার্য সিংগুলারিটি আছে x = 0 বিন্দুতে। অপরিহার্য সিংগুলারিটিরা এক অদ্ভুত দানব। এ ধরনের সিংগুলারিটির কাছাকাছি জায়গায় কার্ভ পাগলের মতো আচরণ করে। সিংগুলারিটির কাছাকাছি গেলে কার্ভটা ক্রমেই দ্রুত থেকে দ্রুততর স্পন্দিত হতে থাকে। একবার ধনাত্মক তো আবার ঋণাত্মক—চলতে থাকে এভাবে। সিংগুলারিটির সবচেয়ে ক্ষুদ্র দূরত্বে কার্ভ কল্পনাযোগ্য সব মান গ্রহণ করতেই থাকে। সিংগুলারিটির আচরণ এতটা অদ্ভুত মনে হলেও গণিতবিদদের কাছে আর রহস্য থাকল না। তাঁরা অসীমকে ব্যবচ্ছেদ করার উপায় জেনে ফেলেছেন।

অসীমকে ব্যবচ্ছেদ করার সে কাজটির নায়ক জর্ক ক্যান্টর। জন্ম ১৮৪৫ সালে রাশিয়ায়। তবে জীবনের বেশিরভাগ কেটেছে জার্মানিতে। গাউস ও রিমানের স্মৃতিবিজড়িত ভূমি। আর এ জার্মানিতেই অসীমের রহস্য উন্মোচিত হয়। দুর্ভাগ্যের ব্যাপার, এই জার্মানিতেই বাস করতেন লিওপোল্ড ক্রোনেকা। যার হেনস্থার শিকার হয়ে ক্যান্টরের স্থান হয় মানসিক চিকিৎসালয়ে।

ক্যান্টর ও ক্রোনেকার দ্বন্দ্বের মূল কারণ অসীম নিয়ে একটি ধারণা। একটি ধাঁধাঁর মাধ্যমে ধারণাটি বোঝা যায়। ধরুন একটি স্টেডিয়ামে অনেক মানুষের সমাগম হয়েছে। আপনি জানতে চান, স্টেডিয়ামে সিট বেশি নাকি আসন বেশি, নাকি দুটোই সমান। এটা জানার একটি উপায় হলো মানুষ ও আসনের সংখ্যা গুণে ফেলা। এরপর দুই সংখ্যা তুলনা করলেই হলো। তবে তাতে সময় লাগবে অনেক। অনেক ভাল আরেকটি উপায় আছে। সবাইকে আসনে বসে যেতে বলুন। খালি আসন দেখা গেলে মানুষের সংখ্যা আসনের চেয়ে কম। আর মানুষকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা গেলে বুঝতে হবে আসনের চেয়ে মানুষ বেশি। কোনো আসন খালি থাকলে এবং কেউ দাঁড়িয়ে না থাকলে মানুষ আর আসনের সংখ্যা সমান।

ক্যান্টর কৌশলটাকে আরও সার্বিক রূপ দেন। সংখ্যার দুটি সেটের আকার একই হবে যদি একটি সেটকে আরেকটি সেটের ওপর বসিয়ে দেওয়া যায় এবং কেউ বাকি না থাকে। যেমন {1, 2, 3} ও {2, 4, 6} সেট দুটির আকার একই। কারণ একটিকে আরেকটির ওপর নিখুঁতভাবে বসিয়ে দেওয়া যাবে। কোনো আসন বাকি থাকবে না। বাকি থাকবে না কোনো সংখ্যাও।

১ ২ ৩

| | |

২ ৪ ৬

কিন্তু {2, 4, 6, 8} সেটটির আকার আলাদা। কারণ এখানে ৮ সিটটি ফাঁকা পড়ে আছে।

১ ২ ৩

| | |

২ ৪ ৬ ৮

তবে অসীম সেট নিয়ে কাজ করতে গেলে ব্যাপারটা মজার হয়ে ওঠে। স্বাভাবিক সংখ্যার সেটটিই ধরুন: {1, 2, 3, …}। নিঃসন্দেহে সেটটা নিজের সমান। সবাইকে নিজের ওপর বসিয়ে দিলে হলো।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ...

| | | | | ...

১ ২ ৩ ৪ ৫ ...

এখানে কোনো //ছলচাতুরি/// নেই। সব সেটই নিজের সমান। কিন্তু সেট থেকে কিছু সংখ্যা সরিয়ে দিলে কী হবে? এই যেমন সরিয়ে দিলাম ১-কে। অদ্ভুত ব্যাপার হলো ১-কে সরিয়ে দিলেও সেটের আকার পরিবর্তন হয় না। আসনবিন্যাস একটু পাল্টে নিলেই সব সংখ্যার জন্য একটা করে আসন পাওয়া যায়। আর সব আসনেই সংখ্যা দেওয়া যায়।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ...

| | | | | ...

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ...

সেটের আকার একই। যদিও একটি আমরা একটি সংখ্যা কমিয়ে দিয়েছি। আসলে আমরা অসীমসংখ্যক সংখ্যাকে সরিয়ে দিতে পারি। আমরা সবগুলো বেজোড় সংখ্যাকে সরিয়ে দিতে পারি। সেটের আকার তাও অপরিবর্তিত থাকবে। এখনও সব সংখ্যার জন্য আসন থাকবে, আর সব আসনে সংখ্যা থাকবে।

২ ৪ ৬ ৮ ১০ ...

| | | | | ...

২ ৩ ৪ ৫ ৬ ...

এটাই আসলে অসীমের সংজ্ঞা। এটা থেকে কাউকে বিয়োগ করলে আকার একই থাকে। বেজোড় সংখ্যা, জোড় সংখ্যা, পূর্ণসংখ্যা সবারই আকার সমান। ক্যান্টর এদেরকে প্রকাশ করেছিলেন ℵo দিয়ে। ℵ হলো হিব্রু বর্ণমালার প্রথম অক্ষর। এদের আকার গণনাবাচক সংখ্যার সমান বলে ℵo এর সমান আকারে সেটকে গণনাযোগ্য (countable) বলা হয় (অবশ্য বাস্তবে এদেরকে গুনে শেষ করা যাবে না। সেটা করতে হলে চাই অসীম সময়।) মূলদ rational) সংখ্যারা (যাদেরকে a/b ভগ্নাংশ আকারে লেখা যায়, যেখানে a ও b পূর্ণসংখ্যা) ছিল গণনাযোগ্য। এটা করতেও ক্যান্টরকে বুদ্ধি বের করতে হয়েছিল। মূলদ সংখ্যাদের তাদের প্রকৃত আসনে বসিয়ে ক্যান্টর দেখান, এরাও ℵo আকারের সেট (দেখুন পরিশিষ্ট ঘ)।

তবে পিথাগোরাস আগেই দেখিয়েছেন, মূলদ সংখ্যারাই সব নয়। তথাকথিত বাস্তব সংখ্যার মধ্যে আছে মূলদ ও অমূলদ দুই ধরনের সংখ্যাই। ক্যান্টর আবিষ্কার করেন, বাস্তব সংখ্যার সেট মূলদ সংখ্যার সেট থেকে অনেক অনেক বড়। যেমন আমাদের আসনবিন্যাস এমন হতে পারে:

আসন বাস্তব সংখ্যা

১ ০.৩১২৫১২৩

২ ০.৭৮৪৩১২২

৩ ০.৯৯৯৯৯৯৯

৪ ০.৬২৬১০০০

৫ ০.২৬৭১১২৩

ক্যান্টর কৌশলটা পেলেন এ তালিকার বাইরের একটি বাস্তব সংখ্যা তৈরি করলেন। প্রথম সংখ্যার প্রথম অঙ্কের দিকে খেয়াল করুন (দশমিকের আগের শূন্যকে বাদ দিয়ে। ০ সবার আগেই আছে, না দিলেও সংখ্যা একই থাকে।)। আমাদের উদাহরণে অঙ্কটা ৩। আমাদের নতুন সংখ্যা প্রথম সংখ্যার সমান হলে ৩ দিয়ে শুরু হত। আমরা সেটা সহজেই এড়িয়ে যেতে পারি। ধরুন আমাদের নতুন সংখ্যার প্রথম অঙ্ক হবে ২। আগের সংখ্যা ৩ দিয়ে শুরু আর আমাদের নতুন সংখ্যা ২ দিয়ে শুরু বলে আমরা জানি দুই সংখ্যা আলাদা হবেই। (এ কথায়ও ফাঁক আছে। যেমন ০.৩০০০… = ০.২৯৯৯…। অনেক মূলদ সংখ্যাকেই দুইভাবে লেখা যায়। তবে এটা গৌণ ব্যাপার। আপাতত আমরা এ ব্যতিক্রম উপেক্ষা করব।)

দ্বিতীয় সংখ্যায় আসি। আমরা কীভাবে নিশ্চিত হব যে নতুন সংখ্যাটা দ্বিতীয় সংখ্যা থেকেও আলাদা হবে? আমরা নতুন সংখ্যার প্রথম অঙ্ক নিয়ে নিয়েছি। এখন আর সে কাজ করা যাবে না। তবে একইরকম বুদ্ধি করা যাবে। দ্বিতীয় সংখ্যার দ্বিতীয় অঙ্ক ৮। আমরা ৮-এর বদলে নতুন সংখ্যা ৭ নিলেই নতুন সংখ্যা ভিন্ন হয়ে যাবে। এভাবে চলতে চলতে তালিকার নিচের দিকে যেতে থাকি। তৃতীয় সংখ্যার তৃতীয় অঙ্ক পাল্টে নেব। চতুর্থ সংখ্যার চতুর্থ অঙ্ক। এভাবেই চলবে।

আসন বাস্তব সংখ্যা নতুন সংখ্যার জন্য অঙ্ক

১ ০.৩১২৫১২৩ ২

২ ০.৭৮৪৩১২২ ৭

৩ ০.৯৯৯৯৯৯৯ ৮

৪ ০.৬২৬১০০০ ০

৫ ০.২৬৭১১২৩ ০

ফলে আমাদের নতুন সংখ্যা হবে ০.২৭৮০০...।

এটা প্রথম সংখ্যা থেকে আলাদা (প্রথম অঙ্কে অমিল)।

এটা দ্বিতীয় সংখ্যা থেকে আলাদা (দ্বিতীয় অঙ্কে অমিল)।

এটা তৃতীয় সংখ্যা থেকে আলাদা (তৃতীয় অঙ্কে অমিল)।

এটা চতুর্থ সংখ্যা থেকে আলাদা (চতুর্থ অঙ্কে অমিল)।

এটা পঞ্চম সংখ্যা থেকে আলাদা (পঞ্চম অঙ্কে অমিল)।

এভাবে কর্ণ বরাবর গিয়ে আমরা নতুন একটি সংখ্যা বানালাম। এভাবে বানানোয় নিশ্চিত হলো সংখ্যাটা তালিকার সব সংখ্যা থেকে আলাদা। তালিকার সব সংখ্যা থেকে আলাদা হলে এটা তালিকায় থাকতে পারে না। তবে আমরা ইতোমধ্যে ধরে নিয়েছি, আমাদের তালিকায় সব বাস্তব সংখ্যা আছে। কারণ আসনবিন্যাস ছিল নিখুঁত। কিন্তু এখন তৈরি হলো অসঙ্গতি। নিখুঁত আসনবিন্যাসের অস্তিত্বই নেই।

বাস্তব সংখ্যারা মূলদ সংখ্যার চেয়ে বড় অসীম। এ ধরনের অসীমের জন্য প্রতীক বরাদ্দ হলো ℵ1। প্রথম অগণনাযোগ্য (uncountable) অসীম। (পারিভাষিকাভাবে বাস্তব রেখার অসীমের প্রতীক ছিল C (continuum infinity বা অসীম পরম্পরা)। আসলেই C-ই ℵ1 কিনা তা জানার জন্য গণিতবিদরা বহু বছর সাধনা করেন। এ ধাঁধাঁর নাম তথাকথিত পরম্পরা অনুকল্প। ১৯৬৩ সালে গণিতবিদ পল কোহেন প্রমাণ করেন, অনুকল্পটিকে ভুল বা সঠিক কোনোটাই প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এটা প্রমাণ করতে কাজে লাগানো গোদেলের অসম্পূর্ণতা উপপাদ্য। বর্তমানে বেশিরভাগ গণিতবিদ পরম্পরা অনুকল্পে সত্য মনে করেন। তবে কেউ আবার অ-ক্যান্টরীয় অসীম সংখ্যার আলোচনায় পরম্পরা অনুকল্পকে ভুল মনে করেন।) ক্যান্টরের মনে ছিল অসীমসংখ্যক অসীম। এদেরকে বলা হয় ট্রান্সফাইনাইট নাম্বার। এক অসীম সেটের ভেতর আরেক অসীম সেট। ℵ1 বড় ℵo-এর চেয়ে। ℵ2 আবার বড় ℵ1-এর চেয়ে। ℵ2-এর চেয়ে বড় ℵ3 ইত্যাদি। সবার ওপরে আছে চূড়ান্ত অসীম। যা গ্রাস করে আছে অন্য সব অসীমকে। ঈশ্বর, যিনি সকল উপলব্ধির উর্ধ্বে।

তবে দূর্ভাগ্য ক্যান্টরের। ঈশ্বরের ধারণা সবার কাছে এক ছিল না। লিওপোল্ড ক্রোনেকা ছিলেন বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের নামকরা অধ্যাপক। একইসাথে ক্যান্টরের শিক্ষক। ক্রোনেকা মনে করতেন, ঈশ্বর কখনোই বিশ্রী অমূলদ সংখ্যার অনুমোদন দেবেন না। আর ক্রমেই বড় হওয়া একের ভেতর অন্য অসীমের তো সুযোগই নেই। তাঁর মতে, পূর্ণসংখ্যারাই ঈশ্বরের বিশুদ্ধতার প্রতীক। আর অমূলদ ও অদ্ভুত সেটেরা ঘৃণিত বস্তু। যা মানুষের ত্রুটিপূর্ণ চিন্তার ফসল। আর ক্যান্টরের ট্রান্সফাইনাইট নাম্বার এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপ বস্তু।

ক্রোনেকা ক্যান্টরের প্রতি চরম বিরক্ত হন। শুরু করেন তীব্র আক্রমণ। ক্যান্টরের গবেষণা প্রকাশ করাকে করে তোলেন কঠিন। ১৮৮৩ সালে ক্যান্টর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পদের জন্য আবেদন করেন। তাঁকে সেখানে নেওয়া হয়নি। পরে তিনি অধ্যাপনার চাকরি নেন হ্যালে বিশ্ববিদ্যালয়ে্‌, যার মান তুলনামূলক অনেক কম। মনে করা হয় বার্লিনে প্রভাবশালী ক্রোনেকা-ই এ জন্য দায়ী। একই বছর তিনি ক্রোনেকার আক্রমণের জবাব দেন। এরপর আসে ১৮৮৪ সাল। ক্যান্টর মানসিক বিপর্যয়ের সর্বশেষ ধাপে পৌঁছে যান।

তবে ক্যান্টরের জন্য স্বান্ত্বনার ব্যাপার হলো, তাঁরই কাজ সেট থিওরি নামে গণিতের নতুন একটি শাখার ভিত্তি রচনা করে দেয়। সেট তত্ত্ব দিয়ে গণিতবিদরা একদম শূন্য থেকে আমাদের জানা সব সংখ্যা তৈরি করতে পারেন। শুধু তাই নয়, তৈরি করা যায় আগে শোনা যায়নি এমনসব সংখ্যাও। অসীমসংখ্যক অসীম। যাদেরকে সাধারণ সংখ্যার মতোই অন্য অসীমের যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ করা যায়। ক্যান্টর সংখ্যার নতুন এক মহাবিশ্ব উন্মুক্ত করে দিলেন। জার্মান গণিতবিদ ডাভিট হিলবার্ট বলেছিলেন, "আমাদেরকে ক্যান্টরের তৈরি স্বর্গ থেকে কেউ তাড়াতে পারবে না।" কিন্তু ততদিনে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। বাকি জীবন ক্যান্টর মানসিক কেন্দ্রে আসা-যাওয়ার মধ্যে ছিলেন। ১৯১৮ সালে হ্যালের মানসিক হাসপাতালেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ক্যান্টর ও ক্রোনেকার লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত ক্যান্টরই জয়ী হন। ক্যান্টরের তত্ত্ব থেকে দেখা যায়, ক্রোনেকার মূল্যবান পূর্ণসংখ্যা এবং এমনকি মূলদ সংখ্যারাও কিছুই নয়। এরা অসীম শূন্য।

মূলদ সংখ্যারা সংখ্যায় অসীম। যেকোনো দুটি সংখ্যার মাঝেও আছে অসীমসংখ্যক সংখ্যা। সংখ্যাদুটি যত কাছে হোক না কেন। এরা আছে সর্বত্র। তবে ক্যান্টরের অসীমের স্তর বলে ভিন্ন কথা। এটা থেকে দেখা যায়, মূলদ সংখ্যারা সংখ্যারেখায় কত কম জায়গা দখল করে।

এত সূক্ষ্ম হিসাব করতে একটু চালাকি করতে হয়েছে। বিষম বা এবড়োথেবড়ো আকৃতির বস্তুর পরিমাপ খুব জটিল। যেমন ধরুন আপনার ঘরের মেঝেতে একটা নোংরা দাগ পড়ল। এ দাগের ক্ষেত্রফল কত? এটা বোঝা সহজ কাজ নয়। আকৃতি বৃত্ত, বর্গ বা ত্রিভুজের মতো হলে সহজেই বলা যেত। একটি মাপকাঠি নিয়ে ব্যাসার্ধ বা ভূমি ও উচ্চতা মেপে ফেললেই হলো। কিন্তু অ্যামিবা প্রাণীর মতো আকৃতির ক্ষেত্রফল মাপার কোনো সূত্র নেই। তবে উপায় একটা আছে।

একটা আয়তাকার কার্পেট দিয়ে দাগটি ঢেকে দিন। দাগ পুরোপুরি ঢাকা পড়লে বুঝব দাগের ক্ষেত্রফল কার্পেটের ক্ষেত্রফলের চেয়ে কম। কার্পেটের ক্ষেত্রফল এক বর্গফুট হলে দাগের ক্ষেত্রফল হবে এক বর্গফুটের কম। আরও ছোট কার্পেট ব্যবহার করলে আমাদের অনুমান ভাল হতে থাকবে। হয়তোবা এক বর্গফুটের এক-অষ্টমাংশ আকারের পাঁচটি কার্পেট দিয়ে দাগটি ঢেকে যাবে। তখন বলা যাবে, কার্পেটের ক্ষেত্রফল এক ফুটের অন্তত পাঁচ-অষ্টমাংশ। যে ক্ষেত্রফল আগের এক বর্গফুটের অনুমানের চেয়ে কম। কার্পেটকে ক্রমেই ছোট করতে থাকলে দাগ আরও ভালভাবে ঢাকা যাবে। আর কার্পেটের ক্ষেত্রফলও দাগের সত্যিকার ক্ষেত্রফলের কাছাকাছি হবে। এবং আসলে দাগের আকারকে কার্পেটের আকারের শূন্যগামী লিমিট হিসেবে প্রকাশ করা যাবে (চিত্র ৪৩)।

এবার একই কাজ করি মূলদ সংখ্যা নিয়ে। তবে এখন আমাদের কার্পেট হোল সংখ্যার সেট। যেমন ধরুন ২.৫ সংখ্যাটিকে ঢাকা হবে এমন কার্পেট দিয়ে, যাতে থাকবে, ধরুন ২ ও ৩-এর মধ্যবর্তী সব সংখ্যা। মানে কার্পেটের আকার ১। এ ধরনের কার্পেট দিয়ে মূলদ সংখ্যাদের ঢাকতে গেলে অদ্ভুত সব ফলাফল দেখা যায়। যেমনটা ক্যান্টর দেখিয়েছেন আসনবিন্যাসের ছকের মাধ্যমে। এ ছকে আছে সব মূলদ সংখ্যা। প্রতিটি মূলদ সংখ্যা পায় একটি করে আসন। অতএব আমরা এদেরকে আসন নং অনুসারে একটি একটি করে ক্রমানুসারে গুনতে পারব। প্রথম মূলদ সংখ্যাটি নিয়ে একে সংখ্যারেখায় কল্পনা করুন। একে এক (১) সাইজের একটি কার্পেট দিয়ে ঢেকে দিন। ঐ একই কার্পেট দিয়ে আরও বহু সংখ্যা ঢেকে যাবে। তবে সেটা নিয়ে আমাদের চিন্তা করতে হবে না। প্রথম সংখ্যাটা ঢাকা হলেই আমরা খুশি।

চিত্র ৪৩: দাগ ঢাকার প্রক্রিয়া

এখন দ্বিতীয় সংখ্যাটি নিন। একে ১/২ আকারের কার্পেট দিয়ে ঢেকে দিন। তৃতীয় সংখ্যাকে ঢাকুন ১/৪ আকারের কার্পেট দিয়ে। এভাবে করে যান। প্রতিটি মূলদ সংখ্যাই আসনবিন্যাসের ছকে আছে। ফলে প্রতিটি মূলদ সংখ্যাই একটি কার্পেট দিয়ে ঢাকা পড়বে। কার্পেটের মোট আকার কত হবে? সংখ্যাটা আমাদের পরিচিত। অ্যাকিলিসের যোগফল। কার্পেটের আকার যোগ করে আমরা পাব 1 + 1/2 + 1/4 + 1/8 + ... + 1/2n । n অনেক বড় হলে এ যোগফল যাবে অসীমের দিকে। ফলে এক সেট কার্পেট দিয়ে আমরা অসীম অসীমসংখ্যক মূলদ সংখ্যা ঢেকে দিতে পারি। আর কার্পেটের আকারের যোগফল হবে ২। তার মানে মূলদ সংখ্যারা ২ এককের চেয়ে কম জায়গা দখল করে।

দাগের ক্ষেত্রে যেমন করেছি, মূলদ সংখ্যার আকারের আরও ভাল অনুমান পেতে কার্পেটের আকার আরও ছোট করতে পারি। ১ আকারের কার্পেটের বদলে আমরা ১/২ আকারের কার্পেট দিয়েই শুরু করতে পারি। এতে করে কার্পেটের আকারের যোগফল হবে ১। মূলদ সংখ্যারা জায়গা দখল করবে ১ এককের কম। ১/১০০০ আকারের কার্পেট দিয়ে শুরু করলে জায়গা দখল হবে ১/৫০০ এককের কম। সব মূলদ সংখ্যা নিয়েও একটা রুমের ১/৫০০ এককের কম দখল করা যাবে। একটি পরমাণুর অর্ধেক আকারের কার্পেট নিয়ে ঢাকা শুরু করলেও সংখ্যারেখায় সব মূলদ সংখ্যাদের ঢেকে দেওয়া যাবে। ফলে এদের মোট আকার হবে একটা পরমাণুর চেয়ে ছোট। তবুও একটা পরমাণুর মধ্যে এঁটে যাওয়া এ মূলদ সংখ্যারাই সব মূলদ সংখ্যাদের ঢেকে দিতে পারে (চিত্র ৪৪)।

আমরা চাইলে আরও আরও ছোট হতে পারব। কার্পেটগুলোর আকার যোগ করলে পরমাণু, নিউট্রন বা কোয়ার্কের অর্ধেক হবে এমন কার্পেট দিয়েও সব মূলদ সংখ্যাকে ঢেকে দেওয়া যাবে। আমরা যত ছোট কল্পনা করতে পারি সে আকারের কার্পেট দিয়েই করা যাবে কাজটা।

তাহলে মূলদ সংখ্যারা ঠিক কত বড়?

তথ্যনির্দেশ

১। চীনা দর্শনে ইন ও ইয়াং হলো দুই বিপরীত বৈশিষ্ট্য। ইন মানে খারাপ, অন্ধকার। আর ইয়াং ভাল, উজ্জ্বল।

২। এ সমীকরণকে সাজিয়ে পাই x2 + 1 = 0। বা x2 = - 1, যার অর্থ হলো কোন সংখ্যাকে বর্গ করলে (-১) পাওয়া যাবে। ১-কে বর্গ করলে ১ পাওয়া যায়। (-১)-কে বর্গ করলেও তাই। তাহলে (-১) কীভাবে পাব? আসলে এমন কোনো বাস্তব সংখ্যা নেই। তবে হ্যাঁ, সংখ্যা আছে। তার নাম কাল্পনিক সংখ্যা। নামটা 'কাল্পনিক' হলেও এ সংখ্যারাও আছে বাস্তব জগতেই।

বিস্তারিত পড়ুন - কাল্পনিক সংখ্যা কি আসলেই কাল্পনিক?

<https://www.statmania.info/2019/07/imaginary-number.html>

৩। যেভাবে বিন্দু থেকে 'বিস্ফোরণের' মাধ্যমে সৃষ্ট মহাবিশ্বের ধারণাকে ফ্রেড হয়েল ব্যঙ্গ করে নাম দেন 'বিগ ব্যাং'। এ নামটিই পরে টিকে যায়।

৪। বাস্তব ও কাল্পনিক সংখ্যার মিশ্রণকে জটিল সংখ্যা বলে। এই যেমন 3 + 4i সংখ্যায় 3 হলো বাস্তব আর 4 কাল্পনিক অংশ।

৫। লিবনিজই প্রথম দেখান, আমাদের চেনাজানা দশভিত্তিক বা দশমিক সংখ্যাকে দুটি অঙ্ক (০ ও ১) দিয়েও লেখা যায়। এভাবে ০ = ০, ১ = ১, ২ = ১০, ৩ = ১১, ৪ = ১০০ ইত্যাদি। এদেরকেই বলে বাইনারি বা দ্বিমিক সংখ্যা। তিনি আরও দেখান, দশমিক সংখ্যার মতোই দ্বিমিক সংখ্যার ক্ষেত্রেও যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগসহ সব গাণিতিক অপারেশন করা যায়।

৬। ইহুদি ধর্মে হোলি স্পিরিট বা পবিত্র আত্মাকে স্বর্গীয় শক্তি, গুণ বা প্রভাব মনে করা হয়। খৃষ্টান ধর্মের একটা বড় অংশে একে তাদের ত্রিত্ববাদ মতবাদের তৃতীয় ব্যক্তি মনে করা হয়। অন্যদিকে ইসলাম ধর্মে রুহুল কুদুস বা পবিত্র আত্মা মনে করা হয় হযরত জিবরাইলকে (আ)।

৭। পঁসলের প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতি গণিতের পুরনো এক অদ্ভুত ধারণা ফিরিয়ে আনে। এর নাম দ্বৈত নীতি। স্কুলে আমরা শিখই, দুটি বিন্দু যোগ করে রেখা পাওয়া যায়। তবে অসীমের বিন্দু মেনে নিলে দুটি রেখা একটি বিন্দু তৈরি করে। বিন্দু ও রেখা একে অপরের দ্বৈত রূপ। ইউক্লিডীয় দ্বিমাত্রিক জ্যামিতির প্রতিটি উপপাদ্যকে দ্বৈত উপায়ে প্রমাণ করা যায় প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতিতে। ফলে প্রক্ষেপণমূলক জ্যামিতির সমান্তরাল মহাবিশ্বে এক গুচ্ছ নতুন উপপাদ্যের জন্ম হলো।

৮। অসীমকে অনেকসময় সংখ্যা ধরা হয়। তবে বাস্তব সংখ্যা বা স্বাভাবিক সংখ্যা বলা হয় না।